বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র–শিক্ষকদের লেজুড়বৃত্তি ছাড়তে হবে

মইনুল ইসলাম

২৪ অক্টোবর ২০১৯, ১০:৫৭
আপডেট: ২৪ অক্টোবর ২০১৯, ১০:৫৮

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের সময় স্বাক্ষরিত কয়েকটি চুক্তির সমালোচনা করে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ার অপরাধে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবরার ফাহাদকে হলের একটি কক্ষে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা পিটিয়ে মেরে ফেলার ঘটনাটি এখন দেশে-বিদেশে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ভারতের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে বললে সেটাকে গুরুতর অপরাধ বিবেচনা করতে হবে কেন? বিশেষত, ভারত যেভাবে বাংলাদেশকে তিস্তা নদীর পানি থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করে চলেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ভারতকে ‘একতরফা মনে হওয়া সুবিধা’ কেন দেওয়া হবে, সে প্রশ্নটা খুবই যৌক্তিক।

আর এ বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশের স্বাধীনতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের না থাকলে সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তচিন্তা চর্চার ঐতিহ্যের পরিপন্থী হবে। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, এই অধিকার বাংলাদেশের সব দেশপ্রেমিক নাগরিকের জন্মগত অধিকার, যা কোনোমতেই ক্ষুণ্ন হতে দেওয়া যায় না। অতএব ভিন্নমত প্রকাশ করে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ার জন্য টর্চার সেলে ধরে নিয়ে আবরারকে পিটিয়ে লাশ বানিয়ে ফেলা যেকোনো বিচারেই অগ্রহণযোগ্য ও অবিবেকি বর্বরতা। এই নির্মম হত্যাকাণ্ড এখন যে ইস্যুটিকে জাতির বিবেকের সামনে নিয়ে এসেছে সেটা হলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আদৌ ছাত্ররাজনীতি এবং শিক্ষকরাজনীতির প্রয়োজন আছে কি না।

সাধারণ জনগণ ও অভিভাবকেরা চাইছেন, বর্তমানে দেশের মূল রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুড়বৃত্তির যে ছাত্র ও শিক্ষকরাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রদের (এমনকি ছাত্রীদেরও) রাজনৈতিক দলগুলোর বিবেকবর্জিত লাঠিয়ালে পরিণত করেছে এবং শিক্ষকদের একাংশকে পদলোভী তদবিরবাজ হিসেবে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের পদলেহী স্তাবকে রূপান্তরিত করেছে, অবিলম্বে তার অবসান হোক। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্ব কিংবা এসব সংগঠনের কর্মী বাহিনী এই বিপুল জনপ্রিয় অবস্থানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে, এটাই স্বাভাবিক। ক্রমেই এই বিতর্কটা জাতির মনোযোগের কেন্দ্রে চলে এসেছে।

এটা উল্লেখযোগ্য, পুলিশের কাছে প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার কয়েকজন ছাত্র বলেছেন, ‘ছাত্রশিবির’ সন্দেহে আবরারকে ধরে

নিয়ে ক্রিকেটের স্টাম্প দিয়ে বেদম প্রহারের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তার মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্রলীগের পরিচালনায় একধরনের ‘টর্চার সেল’ কাজ করে আসছিল। এটা অস্বীকার করা যাবে না যে ছাত্ররাজনীতি সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে চর দখল ও লাঠিয়াল পোষণের পর্যায়ে পৌঁছেছে পাঁচ দশকের আগে। বলতে গেলে স্বাধীনতার আগে বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে। ছাত্রদের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের লাঠিয়ালে পরিণত করার এই অপসংস্কৃতিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে চালু করেছিল স্বৈরাচারী আইয়ুব শাহির

অনুগত গভর্নর মোনেম খান, আর গোপনে সশস্ত্র প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ‘ক্যাডারনির্ভর’ জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘ।

চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের ফার্স্ট বয় হিসেবে এসএসসি পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করে চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হওয়ার পর ১৯৬৫ সালে ‘যাত্রিকের’ মাধ্যমে আমার ছাত্ররাজনীতিতে আসা। চট্টগ্রাম কলেজে তখন ছাত্রলীগ কিংবা ছাত্র ইউনিয়ন সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে স্বনামে রাজনীতি করতে পারত না। ছাত্রলীগের চট্টগ্রাম কলেজের স্থানিক নাম ছিল ‘যাত্রিক’, আর ছাত্র ইউনিয়নের স্থানিক নাম ছিল ইউএসপিপি। ছাত্রলীগের জন্ম ১৯৪৮ সালে, আর আওয়ামী লীগের জন্ম ১৯৪৯ সালে। তার মানে এখন যেমন জিয়াউর রহমানের ১৯৭৬ সালে জারি করা রাজনৈতিক দলবিধির কারণে সব ছাত্রসংগঠনকে রাজনৈতিক দলের আইনগত অঙ্গসংগঠন হতে হয়, তখন সেটার প্রয়োজন ছিল না, এমনকি বাংলাদেশের সংবিধানেও এমন নিয়ম প্রবর্তিত হয়নি।

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু ছয় দফা ঘোষণার পর যাত্রিকে আমার সক্রিয়তা বেড়ে গিয়েছিল, কারণ তখন বুঝতে শুরু করেছিলাম পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শোষণ-লুণ্ঠন থেকে বাঙালির মুক্তি সনদ হলো এই ছয় দফা। অবশ্য রাজনৈতিক সক্রিয়তা বাড়ানো সত্ত্বেও পড়াশোনায় বা পরীক্ষা-প্রস্তুতিতে কোনো ব্যাঘাত ঘটতে দিইনি কখনোই। ১৯৬৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় কুমিল্লা বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি অনার্স কোর্সে ভর্তি হয়েছিলাম, তখন আইয়ুব-মোনেমের মাসলম্যানদের সংগঠন এনএসএফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। আমি ভর্তি হওয়ার কিছুদিন আগেই দেশবরেণ্য অর্থনীতিবিদ ড. আবু মাহমুদ এনএসএফের গুন্ডাদের হাতে প্রহৃত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বিদেশে চলে গিয়েছিলেন, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ঘটনার সুবিচার না করায় দেশের আরেকজন বরেণ্য অর্থনীতিবিদ ড. মুজাফফর আহমদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করে ব্যাংকের চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

আমি হলের নির্বাচনে সহসাধারণ সম্পাদক পদে এনএসএফের নির্বাচনী মনোনয়ন প্রত্যাখ্যান করায় শুরুতেই এনএসএফের কোপদৃষ্টিতে পড়ে গিয়েছিলাম। ১৯৬৮ সালের জুলাইয়ে হলের মেসে এনএসএফের কয়েকজন মাস্তানের ডাবল কাপ খাওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলায় আমাকে এক রাতে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো এক মাস্তানের রুমে মারধর করার জন্য। অবশ্য শেষ পর্যন্ত আমাকে শারীরিক নির্যাতন করল না, অকথ্য গালাগাল করে ছেড়ে দিল। এর মাসখানেকের মধ্যেই এনএসএফের মাস্তান ‘পাসপাত্তু’ খুন হয়ে গেল, বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের

জন্য বন্ধ হয়ে গেল। পাঁচ মাস পর ১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে যখন বিশ্ববিদ্যালয় খুলল, তখন গণ-অভ্যুত্থানের টালমাটাল সংগ্রামের দিনগুলো শুরু হয়ে গেছে।

গণ-অভ্যুত্থানের জোয়ারে ছাত্ররাজনীতির ক্ষমতার ভারসাম্যও পাল্টে গিয়েছিল। ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়ন হয়ে গিয়েছিল গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী প্রবল জনপ্রিয় ছাত্রসংগঠন, এনএসএফের মাসলম্যানরা পালিয়ে পগার পার। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের পাইওনিয়ার ও ভ্যানগার্ড, আর আমরা ছিলাম স্বাধীনতাসংগ্রামের অগ্রসেনানী। সে জন্যই ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে অপারেশন সার্চলাইটের প্রধান টার্গেট হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা। কিন্তু ছাত্রলীগের ভাঙনের পথ ধরে ১৯৭২ সালে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস ও পেশিশক্তি ফিরে এসেছিল।

মাস্টারদা সূর্য সেন হলে প্রতিপক্ষের এক আক্রমণের সময় হলের ছাদের পানির ট্যাংকের তলায় লুকাতে হয়েছিল আমাকেও। ১৯৭৩ সালের ডাকসু নির্বাচনের ব্যালট ছিনতাই এবং ১৯৭৪ সালের মুহসীন হলের সাত হত্যাকাণ্ড ক্ষমতাসীন দলের লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতির অধঃপতনের সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে এখনো। জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালে রাজনৈতিক দলবিধি আদেশ জারির মাধ্যমে সব রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হিসেবে ছাত্রসংগঠনগুলোর আইনি গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়ার সর্বনাশা ব্যবস্থাটি চালু করার পর এখন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ছাত্রসংগঠনগুলোর সম্পর্ক দলীয় ক্যাডার পোষণের অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে পরিণত হয়েছে। জিয়াউর রহমানের শাসনকালের শেষের বছরগুলোতে ছাত্রদল পেশিশক্তির জোরে অন্য সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ত্রাস সঞ্চার করেছে, আবার ইসলামী ছাত্রশিবিরও সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে ক্যাম্পাসগুলোতে শক্তি প্রদর্শন শুরু করেছে। ১৯৮০-এর দশক থেকে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ‘কিলিং স্কোয়াডগুলো’ স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের ছত্রচ্ছায়ায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের ক্যান্টনমেন্টে পরিণত করেছিল।

১৯৯১-৯৬ এবং ২০০১-০৬ মেয়াদে যখন বিএনপি-জামায়াত সরকারে আসীন ছিল, তখন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্র ইসলামী ছাত্রশিবিরের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন। বিশেষত, ২০০১-০৬ মেয়াদের বিএনপি-জামায়াত জোটের শাসনামলে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে থাকার সাহসই পাননি। অতএব ক্ষমতাসীন দলের লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতি ৫০ বছর ধরেই ক্যাম্পাস দখলের অপসংস্কৃতির চর্চা করে চলেছে, এটা ছাত্রলীগের একক কৃতিত্ব নয়।

‘স্বাধীনতা নিউক্লিয়াসের’ সদস্য হয়েও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে ১৯৭৩ সালের ১ আগস্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেওয়ার তারিখেই আমি শপথ নিয়েছিলাম যদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করব, তদ্দিন দলীয় রাজনীতি করব না, যদিও রাজনীতি শিক্ষকদের জন্য নিষিদ্ধ হয়নি। আমার এই অবস্থানের যুক্তি ছিল, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তাঁর শিক্ষকতা, গবেষণা, প্রকাশনা ও সভা-সেমিনারের বক্তব্যে শুধু বিবেকের দ্বারাই পরিচালিত হবেন, কোনো রাজনৈতিক দলকে তুষ্ট করা তাঁর জন্য অবমাননাকর কাজ। কোনো পদের জন্য তদবির করা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে মানায় না, রাষ্ট্রের নীতিপ্রণেতারা যদি কোনো শিক্ষকের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও দক্ষতাকে অপরিহার্য মনে করেন, তাহলে তাঁরা নিজেরাই ওই শিক্ষককে অনুরোধ করে যথাযোগ্য পদে যোগদানে রাজি করাবেন।

১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত যখন সামরিক শাসকেরা ক্ষমতাসীন ছিলেন, তখন শাসকদের দালালি করতে উন্মুখ শিক্ষকেরা কিছুটা রাখঢাক করতেন। কিন্তু ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়া ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ২৮ বছর ধরে কিছু শিক্ষকের কাছে দলীয় রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি ও নানা পদের জন্য তদবির হয়ে গেছে প্রধান ধান্দা। এখন কি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দাবি করতে পারবেন যে সরকার তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে উপাচার্য নিয়োগ করেছে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতি ও শিক্ষকরাজনীতি জাতির সর্বনাশ করে চলেছে। তাই প্রধানমন্ত্রীর কাছে আকুল আবেদন, লেজুড়বৃত্তির শৃঙ্খল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের মুক্তি দিন। লাঠিয়াল পালনের অপরাজনীতি পরিত্যাগের ঘোষণা দিন। ১৯৭৬ সালের রাজনৈতিক দলবিধি আদেশ বাতিল করুন। সার্চ কমিটির মাধ্যমে উপাচার্য নিয়োগ দিন।

ড. মইনুল ইসলাম *অর্থনীতিবিদ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক*